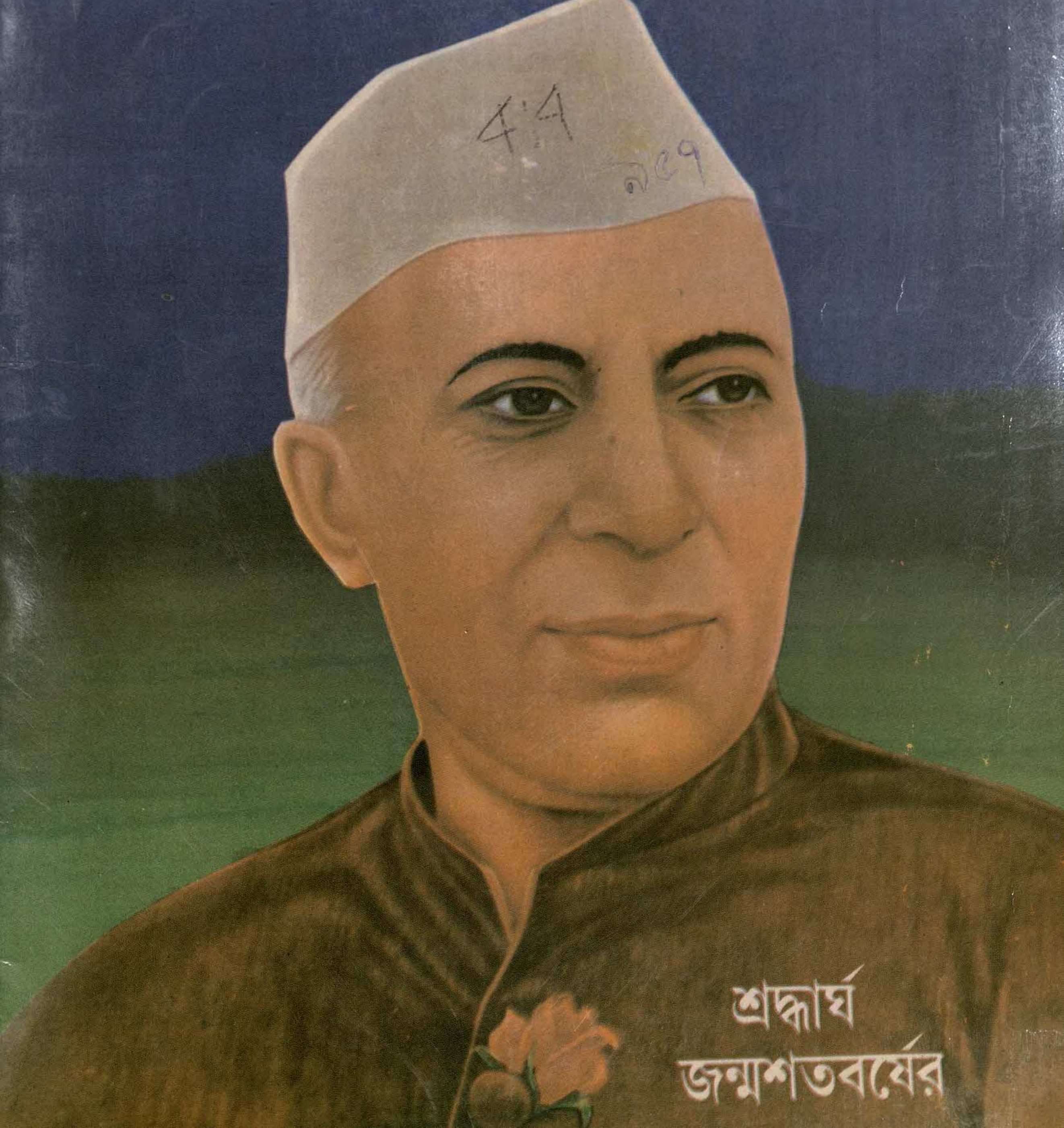
ভারত পথিক জওহরলাল



শ্রদ্ধার্ঘ
জন্মশতবর্ষের

ভারত পথিক জওহরলাল

আশিস সান্যাল



1889 1989

মণ্ডল এন্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ সুধীর কুমার মণ্ডল
মণ্ডল এ্যান্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট্
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ আগরতলা বইমেলা ১৯৮৯

মূল্য ঃ দশ টাকা

প্রচ্ছদ ঃ অরুণাংশু চৌধুরী
অলংকরণঃ তরুণ চক্রবর্তী

মুদ্রাকর ঃ কম্পু কালার
কলিকাতা-৯

ফটোটাইপ সেটিং ঃ ইন্‌টেক প্রিন্ট সিস্টেমস্
পি-১০২, ব্লক-ডি, বাঙ্গুর এ্যাভেন্যু,
কলিকাতা-৫৫

নিবেদন

আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব জওহরলাল। স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং নতুন ভারত গঠনে তাঁর অবদান অপরিসীম। এখানে শিশুদের উপযোগী করে পরিবেশিত হলো তাঁর জীবন-কাহিনী। শিশু ও কিশোর মানসে মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনীর প্রভাব খুবই ব্যাপক। তাঁদের জীবন-কাহিনী পাঠের মাধ্যমে শিশু ও কিশোরদের মানসিক উৎকর্ষ ঘটে এবং চিত্ত-শতদল স্বাভাবিক সৌন্দর্যে বিকশিত হয়। তাঁদের মহান আদর্শে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয় শিশু ও কিশোররা। ভাবীকালের নতুন নাম-করা হয়তো এগিয়ে আসে এভাবেই। সেই কথা মনে রেখেই শিশুদের জন্য জওহরলালের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী। যদি শিশুদের ভালো লাগে, তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করবো।

আশিস সান্যাল

ফেব্রুয়ারী ২৬, ১৯৮৯



মতিলাল নেহরু ছিলেন সেকালের বিখ্যাত আইনজীবী। প্রচুর উপার্জন ছিলো তাঁর। সেকালের অন্যান্য ধনী পরিবারের মতো তাঁর পরিবারের জীবনধারা হয়ে উঠেছিলো পাশ্চাত্যমুখী। তাঁর এলাহাবাদের বাড়িতেই

সাঁতারের উপযোগী পুকুর, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ছিলো। বাজারে নতুন কিছু এলেই তা মতিলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

সাইকেল ছিলো সেকালের এক আশ্চর্য আবিষ্কার। মতিলাল নেহরুর বাড়িতে ছিলো নানা মডেলের সাইকেল। ১৯০৪ সালে তিনি একটা মোটর গাড়িও কিনেছিলেন। বোধ হয়, সারা উত্তর ভারতে সেটাই ছিলো প্রথম মোটর গাড়ি। এছাড়া ছিলো তাঁর বাড়িতে নানা ধরনের ঘোড়ার গাড়ি।

মতিলাল নেহরুর ঘোড়ায় চড়া ছিলো একটা প্রধান শখ তাঁর বাড়ির ছেলে-মেয়েরাও ছোটবেলা থেকেই শিখতো ঘোড়ায় চড়া।

একদিনের ঘটনা। মতিলাল নেহরুর দ্বিতীয় পুত্র জওহরলালের তখন আর বয়স কতো হবে! খুব জোর সাত কি আট। জেদ ধরলো, ঘোড়া ছুটিয়ে ঘুরে আসবে। বাবা মতিলাল সহিসের সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন। ধীরে ধীরে চলছিলো ঘোড়াটি। লাগাম ছিলো সহিসের হাতে। কিন্তু ধীরে চলতে ভালো লাগছিলো না জওহরলালের। সহিসকে কোনমতে রাজি করিয়ে লাগাম নিলো নিজের হাতে। তারপর ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারতেই ঘোড়া ছুটতে আরম্ভ করলো। এতো জোরে ঘোড়া ছুটছিলো যে বালক জওহরলাল টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো মাটিতে। ঘোড়াটি ছুটতে ছুটতে চলে এলো বাড়িতে।

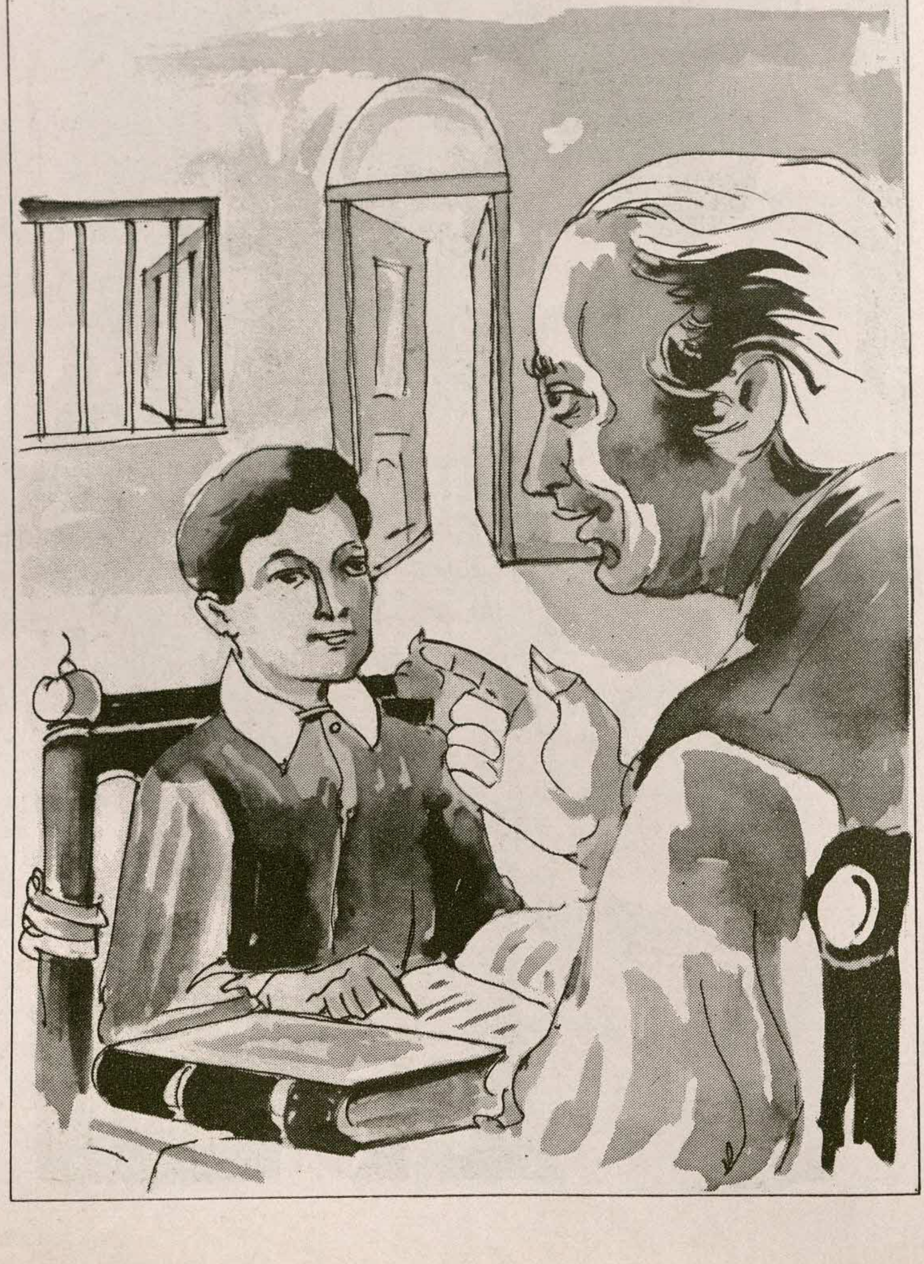
বাবা মতিলাল তো ঘোড়ার পিঠে কাউকে না দেখে খুব চিন্তিত হলেন। একটু পরেই হাঁটতে হাঁটতে ফিরলো জওহরলাল। বাবাকে গিয়ে বললো—'ঘোড়াটা আমাকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছে। তবে আমি ছাড়ছি না', আবার ওর পিঠে চড়ে ঘুরে আসবো।'

'সাবাস! এই তো চাই!' উৎসাহ দিয়ে বললেন মতিলাল।

এই হলো আমাদের জওহরলাল। বালক বয়স থেকেই ছিলেন জেদি। কোনও কাজ করবো মনে করলে না করে ছাড়তেন না। ভাবীকালের নায়ক জওহরলালের জন্ম হয় ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর এলাহাবাদে। মায়ের নাম স্বরূপরাণী।



শিক্ষাদীক্ষা তাঁর পাশ্চাত্যধারাতেই শুরু হলো। অগাধ স্নেহ-মমতা এবং বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তিনি। তবে তাঁর শৈশব বড় নিঃসঙ্গ ছিলো। সমবয়সী বন্ধু প্রায় ছিলো না। স্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গ বা সখ্যও তাঁর জোটেনি। কারণ, কোনও বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তিনি পাননি। বাড়িতেই গভর্নেস বা গৃহশিক্ষকরা তাঁর লেখা-পড়ার তদারকি করতেন।



বালক বয়সের আরো অনেক ঘটনার কথা তিনি নিজেই আত্মজীবনীতে লিখে গেছেন। একদিনের একটি ঘটনার কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাচ্ছে। তিনি তাঁর বাবা মতিলাল নেহরুকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সাহস ও বুদ্ধিমত্তা জওহরলালকে আকর্ষণ করতো। মনে মনে বাবার মতো হবার কথা ভাবতেন তিনি। ভয়ও করতেন তাঁকে। যখন তাঁর বয়স পাঁচ কি ছয়, তখন একদিন বাবার অফিস-ঘরে গিয়ে দেখেন দুটি সুন্দর পেন রয়েছে। একটু লোভ হলো জওহরলালের। ভাবলেন, বাবা দুটো পেন দিয়ে কি করবেন। তাই ভেবে, একটা পেন কাউকে না জানিয়ে নিয়ে গেলেন।

তারপর সারা বাড়ি জুড়ে এক তুমুল কাণ্ড। বাবা বাড়ি ফিরেই কলমটা টেবিলে না দেখে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। চাকরদের আদেশ দিলেন, যেমন করে হোক কলম খুঁজে বের করতে। বালক জওহরলাল এতো ভয় পেলেন যে সত্যিকথাটা বলতে পারলেন না। তারপর যখন তাঁর ঘর থেকেই কলমটি পাওয়া গেলো, তখন বাবার সে কি তিরস্কার। চোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসে।

পাশ্চাত্য জীবনধারার পাশাপাশি তাঁদের এলাহাবাদের বাড়িতে ভারতীয় জীবনধারাও ছিলো প্রবাহিত। মা স্বরূপরাণী, জেঠিমা নন্দরাণী এবং মাসীমা রাজবতী ভারতীয় হিন্দু মহিলার মতো জীবন-যাপন করতেন। জওহরলালের জীবনে এঁদের প্রভাবও অপরিসীম। এ-কারণে বালক বয়স থেকেই ভারতের মন-প্রাণ এবং আত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। মনে হতো, ভারতের সম্মান যেন তাঁর নিজের সম্মান।

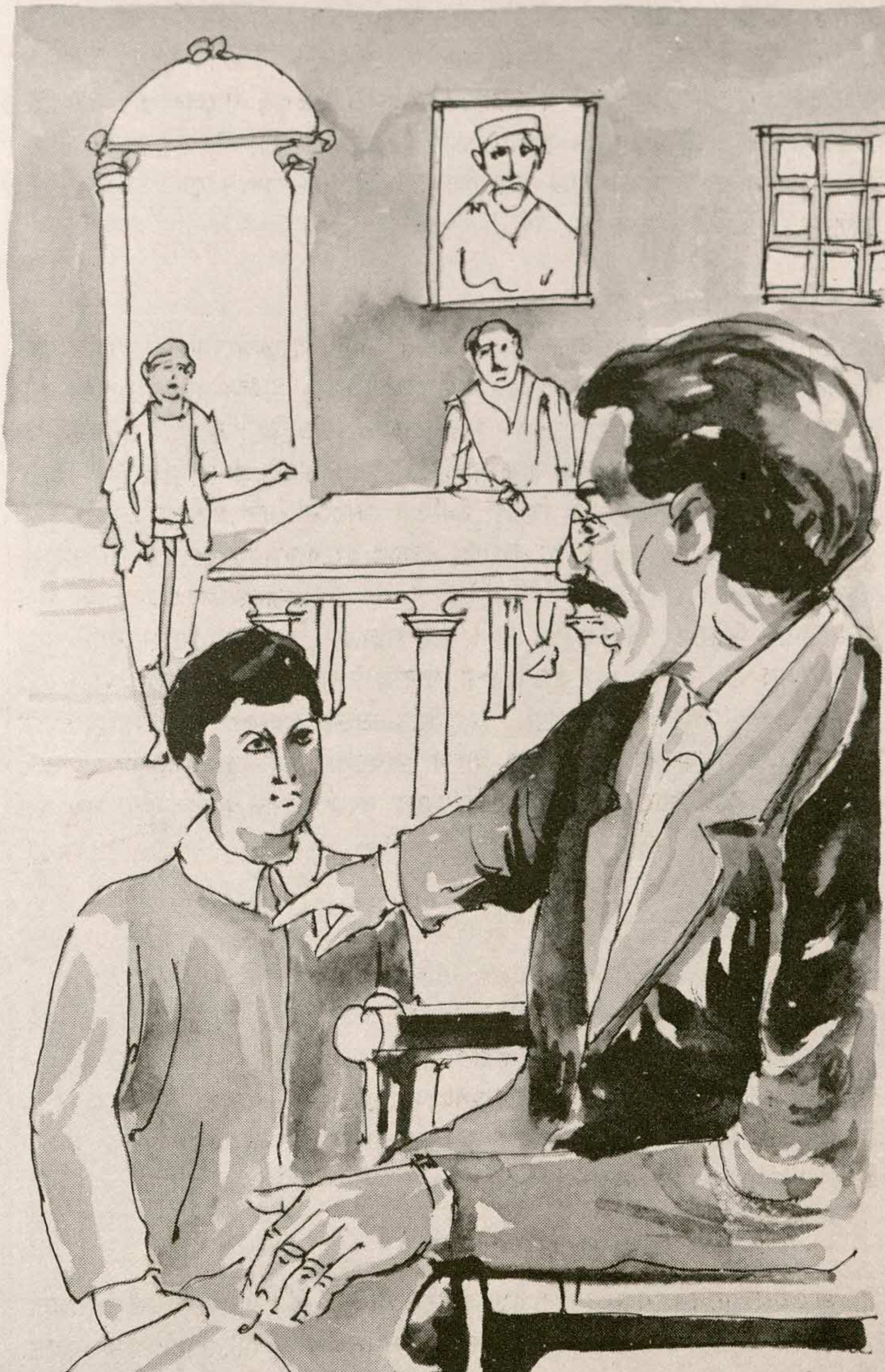
ভারতের পরাধীনতায় তাঁর হৃদয়-ব্যথিত হতো সেই বালক-বয়স থেকেই। কেমন যেন বেদনা অনুভব করতেন তিনি। নিজেই বলেছেন তিনি ঃ 'আমার বয়স্ক জেঠতুতো দাদাদের আলাপ-আলোচনা শুনতাম সব সময়ে সবটা না বুঝেই। প্রায়ই এই সব কথাবার্তায় থাকতো, ভারতীয়দের প্রতি ইউরোপীয় ও ইংরেজদের অপমানকর আচরণের কথা। ভারতীয়দের এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত এবং এ-সব সহ্য করা উচিত নয়—আলোচনায় এ-সব স্থান পেতো। একজন ইংরেজ কোনও ভারতীয়কে খুন করলে সেই খুনী তার স্বদেশীয় জুরীদের বিচারে খালাস

পেয়ে যেতো। ট্রেনগুলিতে যতোই ভিড় থাক, ট্রেনের অনেক কামরা ইউরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত থাকতো। সেই সব কামরা খালি থাকলেও ভারতীয়দের তাতে চড়তে দেওয়া হতো না। ...আমার দেশে যে বিদেশী শাসকরা এরকম দুর্ব্যবহার করতো, তা শুনে আমার মন রুষ্ট হয়ে উঠতো। কোনও ভারতীয় এর উপযুক্ত প্রত্যাঘাত দিলে আমি খুশি হতাম।'

ষোল বছর পর্যন্ত জওহরলালের শিক্ষা বাড়িতেই হয়েছিলো গৃহশিক্ষকদের কাছে। তাঁর গৃহশিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। তাঁর নাম এফ·টি·ব্রুক্স। জওহরলালের জীবনে তাঁর বিরাট প্রভাব রয়েছে। তিনিই জওহরলালকে সাহিত্য পাঠ এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে উৎসাহিত করেন। এই ব্রুক্সকে জওহরলালের গৃহশিক্ষক ঠিক করে দিয়েছিলেন শ্রীমতী অ্যানী বেসান্ত। বেসান্ত ছিলেন নেহরু পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিদেশিনী হয়েও ভারতবর্ষকে পূর্বজন্মের মাতৃভূমি হিসেবে গণ্য করতেন। এই তেজস্বিনী ভারত-হিতৈষী মহিলার প্রভাবও জওহরলালের জীবনের অনেকটা আচ্ছন্ন করেছিলো।

ষোল বছরের কিশোর জওহরলালকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য ইংলন্ড পাঠানো স্থির করলেন মতিলাল। ১৯০৫ সালের ১৩মে রুগ্না স্ত্রী স্বরূপরাণী, জওহরলাল এবং চার বছরের কন্যাকে নিয়ে বোম্বাই থেকে জাহাজে ইংলন্ড রওনা হলেন মতিলাল। ইংলন্ডে এসে কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে জওহরলালকে অভিজাত শ্রেণীর বিখ্যাত বিদ্যালয় হ্যারোতে ভর্তি করালেন। কিছুদিন পর মতিলাল ফিরে এলেন দেশে। জওহরলাল এই প্রথম পরিবার থেকে দূরে রইলেন। পিতা-পুত্রের এই বিচ্ছেদ বড় করুণ ছিলো। মতিলাল এলাহাবাদের বাড়ির নাম দিয়েছিলেন 'আনন্দ-ভবন'। এই সময় জওহরলালকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ 'আনন্দ-ভবনে আর তেমন আনন্দ নেই।' দূরে শিক্ষারত পুত্রের অনুপস্থিতিতে মতিলাল আরো কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন।

হ্যারোতে জওহরলালের পড়াশুনা দ্রুত এগিয়েছিলো। তিনি তাঁর শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। বিজ্ঞান ও গণিতে তাঁর আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলো। তিনি বিদ্যালয়ের ক্যাডেট কোরে যোগ দিয়েছিলেন।



হ্যারোতে জওহরলাল সকল বিষয়েই পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষক উড সাহেব বার বার মতিলালকে চিঠিতে পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা প্রকাশ করতে থাকেন। ১৯০৭ সালের ৩১ জুলাই জওহরলাল হ্যারো ছেড়ে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি দেশে ফেরেন ১৯১২ সালে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তখন ভাটা পড়েছিলো। বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন তখন জেলে। এর আগে যখন লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দু' টুকরো করতে চেয়েছিলেন, তখন সারা ভারত গর্জে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে প্রায় সব রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেছিলেন। সে ছিলো জাতির জীবনে দেশপ্রেমের এক নতুন জোয়ার। কিন্তু ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব ইংরেজসরকার তুলে নেওয়ায় স্বদেশী আন্দোলনে তেমন উৎসাহ ছিলো না। কি করবেন জওহরলাল, তা ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। ওই বছরের ডিসেম্বর মাসে বাঁকিপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়েছিলো, তাতে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। এই প্রথম জওহরলালের কংগ্রেসে পদার্পণ। তবে তখনও কংগ্রেস সংগঠন হিসেবে উৎসাহ বা উদ্দীপনা লক্ষ্য করলেন না জওহরলাল। তাই এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিস্টার হিসেবে কাজ শুরু করলেন। সফলও হলেন।

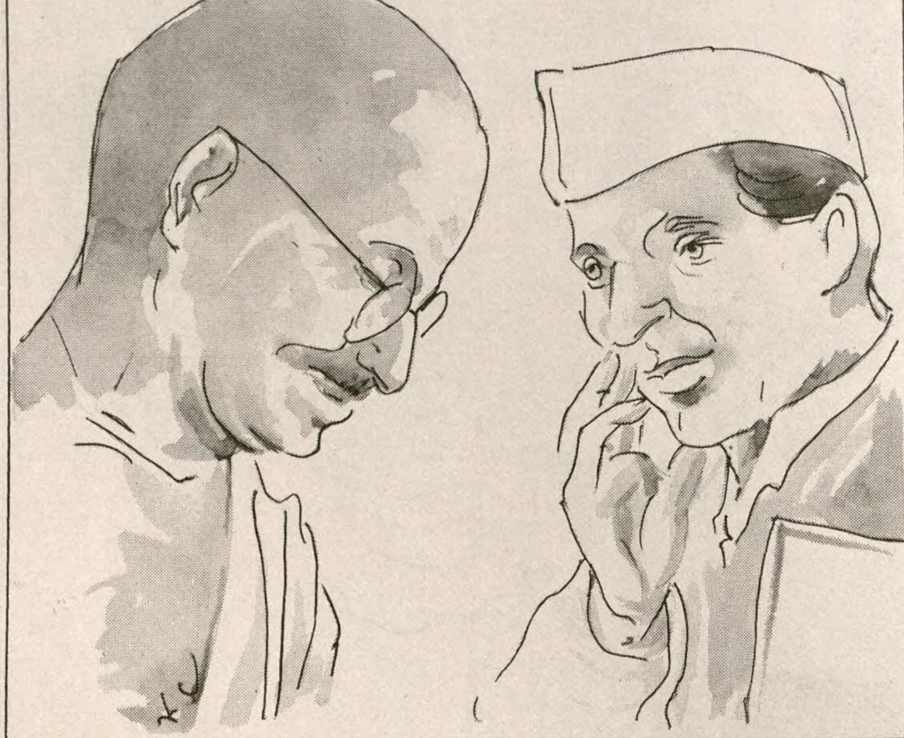
অথচ ছাত্র-জীবনে খুব একটা ভাষণ দিতে পারতেন না। ১৯১১ সালের আগস্ট মাসে পিতা মতিলালকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ "এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করার মতো ভয়ানক জিনিস আমি কল্পনা করতেও পারি না।' সেই জওহরলাল নেহরুই পরবর্তী জীবনে হয়ে উঠেছিলেন বিরাট বাগ্মী। দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তৃতা শুনতেন।

জওহরলালের বিয়ে হয় ১৯১৬ সালে দিল্লীর ধনী ব্যবসায়ী জওহরমল কাউলের কন্যা কমলা কাউলের সঙ্গে। যখন তিনি হ্যারোতে পড়ছিলেন, তখনই তাঁর বিয়ের কথা ওঠে। কিন্তু পিতা মতিলাল ছিলেন সেকালের

নব্য-ভাবধারার সমর্থক। বাল্য-বিবাহের তিনি ছিলেন বিরোধী। বিয়ে হলো ফেব্রুয়ারী মাসে। সেদিন ছিলো বাসন্তী পঞ্চমী—সরস্বতী পূজার দিন। বিয়ে হয় দিল্লীতে। এলাহাবাদ থেকে একটি স্পেশাল ট্রেনে নেহরু পরিবারের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন আসেন দিল্লীতে। বিয়ের পর সবাই ফিরে আসেন আবার এলাহাবাদে। বিয়ের এক বছর পরেই একটি কন্যা হলো তাঁদের। এই কন্যার নাম-ই ইন্দিরা—প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা। ডাকনাম ইন্দু।



গান্ধীজির সঙ্গে জওহরলালের প্রথম দেখা হয় ১৯১৬সালের লক্‌নৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়। গান্ধীজির নাম অবশ্য এর অনেক আগেই শুনেছিলেন। শুনেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা। জওহরলাল এ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ 'দক্ষিণ আফ্রিকায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আমাদের মতো তরুণদের অনেকের কাছেই তাঁকে দূর, অন্য ধরনের এবং অরাজনৈতিক মনে হতো।' কিন্তু চম্পারণ গরীব নীলচাষীদের জন্য তাঁর আন্দোলন এবং আন্দোলনে জয়লাভ সকলকে তাঁর সম্বন্ধে উৎসাহিত করে তুললো। জওহরলালের ভাষায় ঃ 'আমরা দেখলাম, ভারতেও তিনি তাঁর নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করতে প্রস্তুত—এবং এই সব কৌশল ছিলো সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ।'



ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্রমশ গান্ধীজির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকলো এবং ক্রমশ জওহরলাল গান্ধী নির্দেশিত অহিংস আন্দোলনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন। গান্ধীজির রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতা ক্রমশ তাঁকে মুগ্ধ করতে আরম্ভ করলো। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে বসলো কংগ্রেসের অধিবেশন। মতিলাল ছিলেন সভাপতি। বলতে গেলে, গান্ধী আদর্শের পূর্ণ অভিষেক হলো সেই অধিবেশনে। 'আত্মজীবনী'তে জওহরলাল লিখেছেন ঃ 'অমৃতসর কংগ্রেস-ই ছিলো গান্ধী কংগ্রেস। লোকমান্য তিলকও উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং বাইরের উপস্থিত বিশাল জনতা যে গান্ধীজির নেতৃত্বের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলো, তাতে কোনও সংশয় ছিলো না। "মহাত্মা গান্ধী কী জয়" ধ্বনিই ভারতীয় রাজনীতির দিগন্তে প্রাধান্যলাভ করতে শুরু করেছিলো।" জওহরলাল হয়ে উঠলেন গান্ধীজির মন্ত্রশিষ্য।

ভারতের সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে তখনও জওহরলাল তেমন কিছু জানতেন না। ১৯২০ সালের কাছাকাছি সময়ে একটা ঘটনা ঘটলো তাঁর জীবনে। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের গ্রামাঞ্চল থেকে কয়েক শত কৃষক এসেছিলো এলাহাবাদে তাঁদের কথা নেতাদের জানাতে। রামচন্দ্র নামে এক মারাঠী সাধু তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কৃষকরা এলাহাবাদের যমুনা তীরে অপেক্ষা করছিলেন। খবর পেয়ে জওহরলাল কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে গেলেন সেখানে। কৃষকরা বললেন—

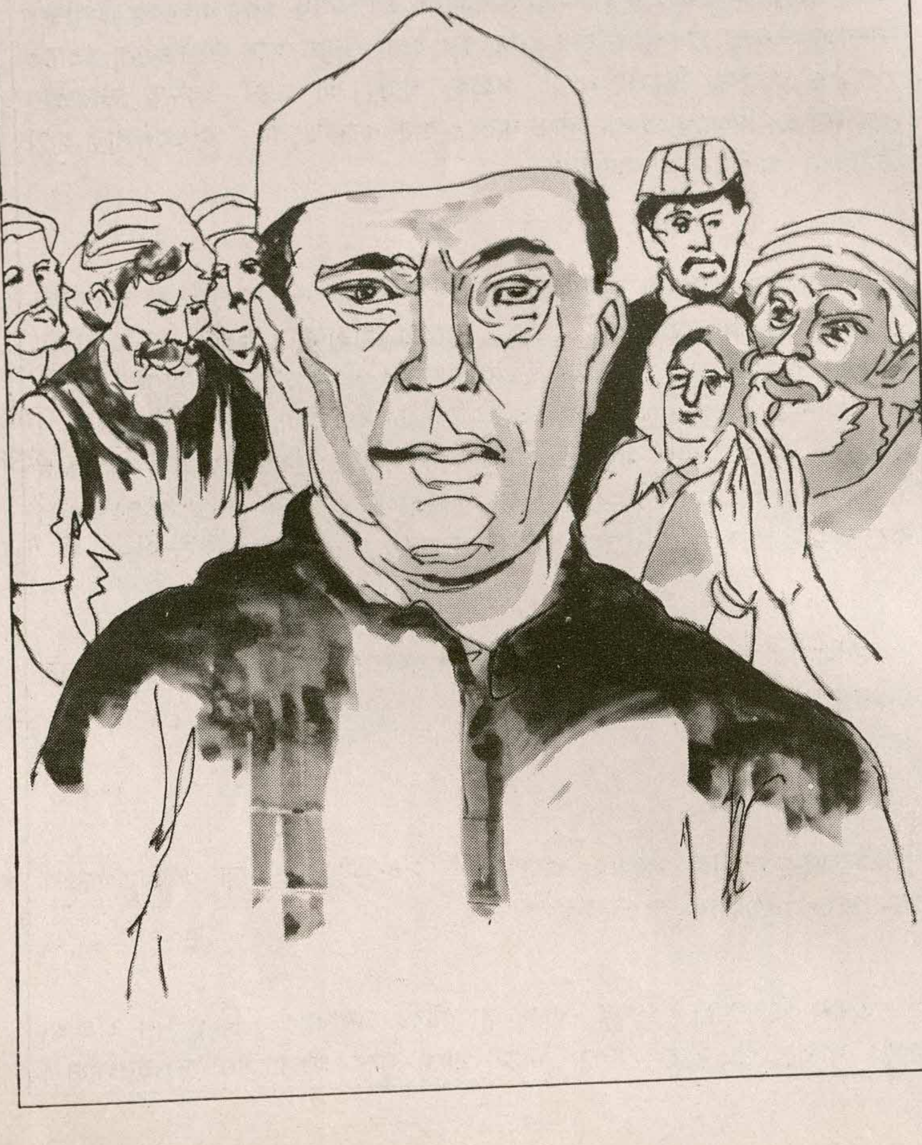
জমিদার আর তালুকদাররা আমাদের যেভাবে নির্যাতন করছে, তা যদি একবার স্বচক্ষে দেখে যান।'

'নিশ্চয়ই যাবো।'

কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে প্রতাপগড়ের গ্রামাঞ্চলে গেলেন জওহরলাল।

তখন গ্রীষ্মকাল। দুপুর রোদে ল্যু বইছে চারদিকে। কিন্তু সব অগ্রাহ্য করে মাথায় তোয়ালে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ালেন জওহরলাল।

দেখছেন গরীব ভারতের গরীব মানুষদের। গ্রামের মানুষদের স্নেহ-ভালোবাসায় তিনি অভিভূত হলেন। বুঝলেন, এই হলো ভারতের প্রাণ। গ্রামের গরীব মানুষদের দুঃখ দূর করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন তিনি।



দেশব্যাপী তখন অহিংস সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছিলো। এই আন্দোলনের মূলকথা ছিলো ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সব রকম অসহযোগিতা। অনেকে তখন এই আন্দোলনের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। কিন্তু মতিলাল নেহরু সর্বতোভাবে সমর্থন জানালেন গান্ধী নির্দেশিত অসহযোগ আন্দোলনকে।

ঠিক হলো—উপাধি, অবৈতনিক পদ, সরকারী অনুষ্ঠান সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ, আদালত, আইনসভা এবং বিদেশীপণ্য বর্জন করতে হবে। এই কর্মসূচী নেহরু পরিবারে এক বিপ্লব ঘটালো। মতিলাল নেহরু আদালত বর্জন করলেন। কন্যা কৃষ্ণাকে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। বিদেশী জিনিসপত্র বাড়ি থেকে বের করে পুড়িয়ে ফেলা হলো। 'আনন্দ ভবন' হয়ে উঠলো নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সদর কার্যালয়।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ সরকার খিলাফত আন্দোলনের দুই নেতা মহম্মদ আলি ও সওকত আলিকে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ প্ররোচনা সৃষ্টির অপরাধে গ্রেপ্তার করে। গান্ধীজির নেতৃত্বে সেকালের বিশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ জন নেতা প্রতিবাদ করে ইস্তাহার প্রকাশ করেন। মতিলাল ও জওহরলাল—দু'জনেই এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর দেন। ১৯২১ সালে ইংলন্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারত ভ্রমণে আসার কথা। কংগ্রেস তাঁর আগমনের দিন হরতালের ডাক দেন। হরতালের সমর্থনে প্রচারপত্র বিলির অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই তাঁর প্রথম কারাবরণ। তারপর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন।

কারাগারের মধ্যেও তাঁর কাজ থেমে ছিলো না। বসে বসে বই লিখেছেন। 'আত্মজীবনী' 'বিশ্ব-ইতিহাসের ঝলক', 'ভারত আবিষ্কার' বা কন্যা ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা বিখ্যাত সব সৃষ্টি জেলখানাতেই রচিত।

স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের পুরোভাগে চলে আসেন জওহরলাল। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। ২৫ ডিসেম্বর তিনি

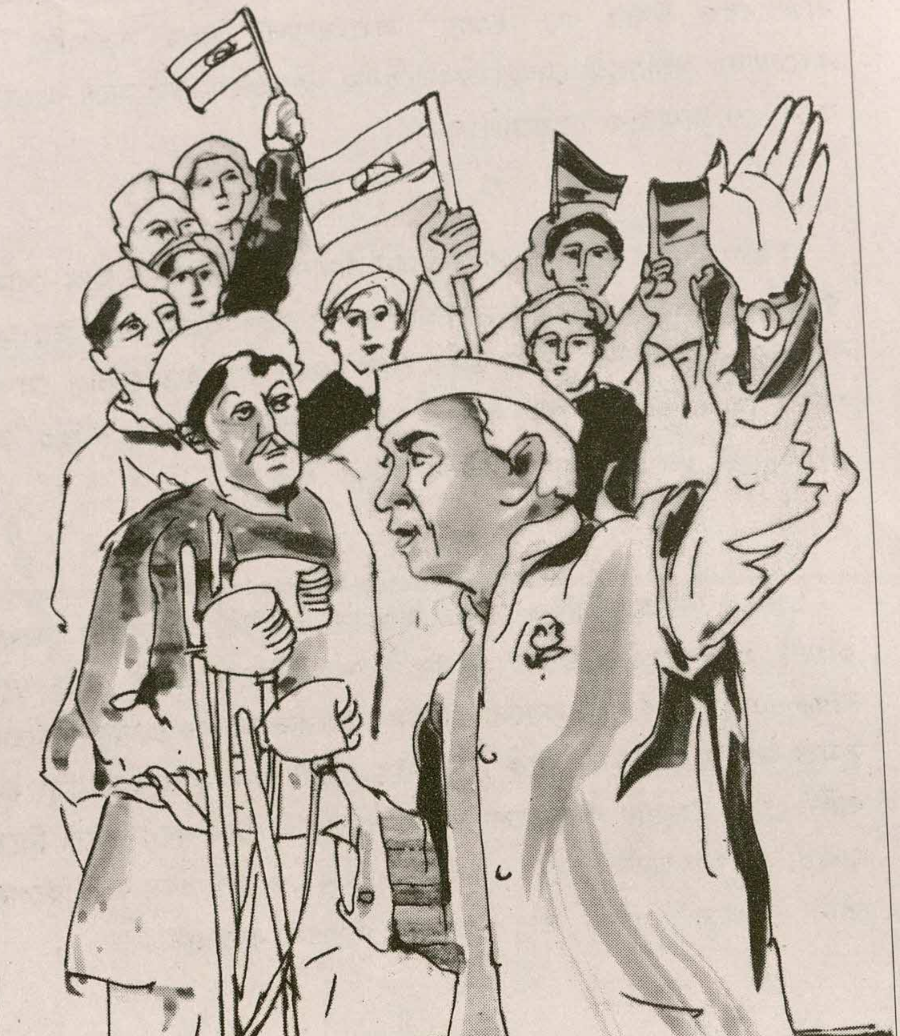


লাহোর এসে পৌঁছান, তখন তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটেছিলো। একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিলো ঃ 'এই সম্বর্ধনা রাজাদেরও ঈর্ষার বস্তু ছিলো।' জওহরলালই প্রথম সভাপতি যিনি কংগ্রেসের অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর পুরোভাগে শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছিলেন।

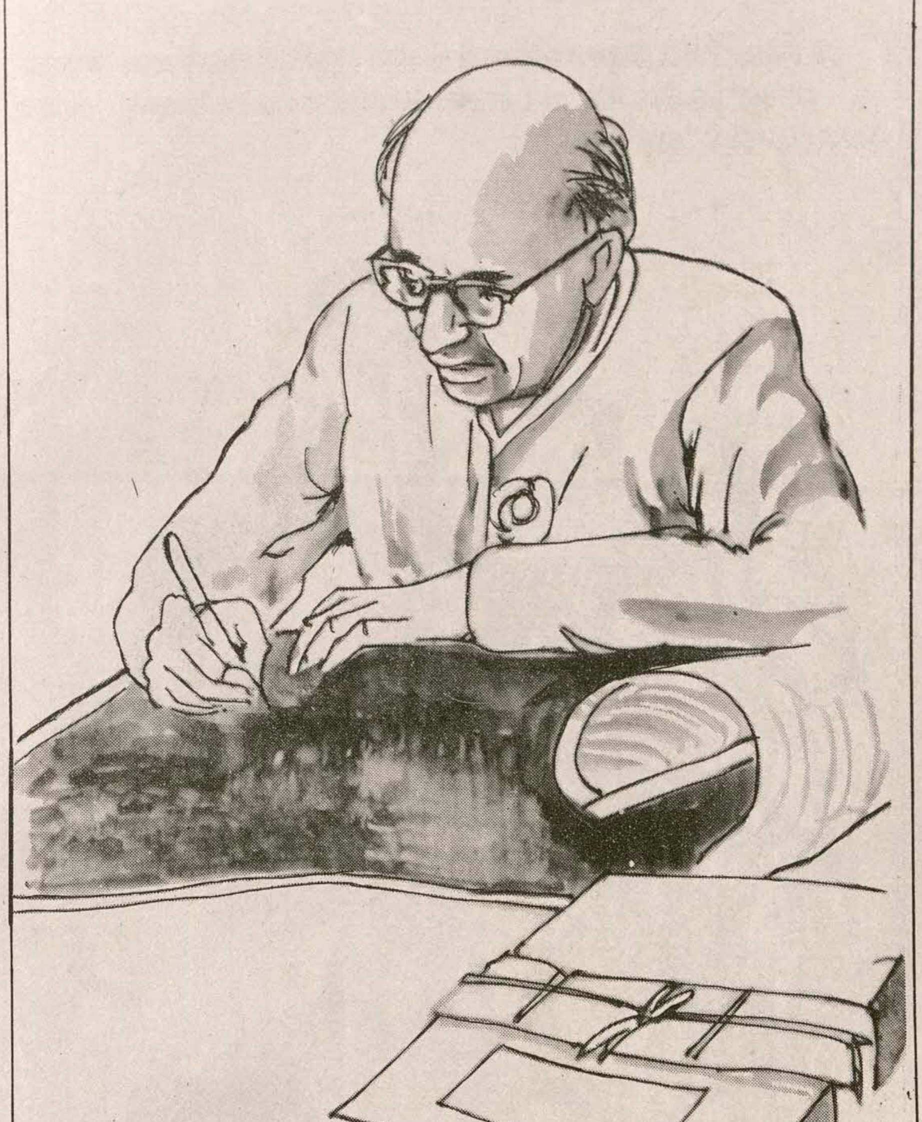
১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের কথা ঘোষণা করেন। জওহরলাল লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন এবং ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তখন তাঁকে নৈনী জেলে রাখা হয়েছিলো। সেখান থেকে মুক্তি পাবার পর আবার দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এলাহাবাদে, একটি কৃষক সম্মেলন করার জন্য।

১৯৪২ সালের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হলো। অর্থাৎ বৃটিশ অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে যাক—এই প্রস্তাব গ্রহণ করলো কংগ্রেস। ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করলেন সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতাকে। বোম্বাইয়ে ছোট বোন কৃষ্ণা হাতী সিংয়ের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হলো জওহরলালকে। ট্রেনে করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় আহম্মদনগর দুর্গে। ১৯৪৫ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত বন্দী ছিলেন তিনি সেখানে। এটাই তাঁর শেষ এবং দীর্ঘতম কারাবাস।

গান্ধী, জওহরলাল প্রমুখ নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর শোনামাত্র সারা দেশ ঘৃণা, ক্ষোভ ও বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। শুরু হয়ে গেলো দেশব্যাপী সংগ্রাম। ইংরেজ কঠোর দমননীতির আশ্রয় নিয়েছিলো। জনতার এই জাগরণকে গুলি, লাঠি ও গ্রেপ্তার করে স্তব্ধ করতে চাইলো। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত অর্জন করলো স্বাধীনতা।



স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহরু। নতুন ভারত গঠনে তাঁর অবদান অপরিসীম। নতুন ভারতের নতুন সংবিধান রচিত হবার পর তিনি বলেন ঃ 'তাঁর স্বপ্নের ভারতে থাকবে না দারিদ্র্য আর অশিক্ষা, থাকবে না জরা-ব্যাধির নাম। একজোট হয়ে কাজ করবে সকলে। সকলের হবে সমান অধিকার।'



দেশের নতুন পরিকল্পনাগুলি ছিলো তাঁর কাছে তীর্থের মতো। ১৯৬৪ সালের ২৭মে তাঁর মৃত্যুর পর যে ইচ্ছা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে, তাতে শোনা যায় সেই কথারই প্রতিধ্বনিঃ ভারতের মাটি, ভারতের প্রতি ধূলিকণা, গঙ্গা, হিমালয়, শস্য-শ্যামল প্রান্তর, এবং সর্বোপরি ভারতের জনসাধারণের প্রতি ফুটে উঠেছে তাঁর গভীর ভালোবাসা।

ছোটদের তিনি ভালোবাসতেন মন-প্রাণ দিয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ছোটরাই একদিন বড় হয়ে দেশের ভবিষ্যৎকে করবে উজ্জ্বল। ছোটরা তাঁকে বলতো 'চাচা নেহরু'।



গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি ছিলো তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন ঃ 'আপনার আশীর্বাদে এবং আমরা যারা প্রায়ই ভুল করি, তাদের সত্য পথে ধরে রাখবার জন্য যে আপনি রয়েছেন এই কথা ভেবে আমি শান্তি পাই।' দেশ স্বাধীন হবার পর রবীন্দ্রনাথের 'জন-গণ-মন'কে জাতীয়সঙ্গীত করার পিছনেও রয়েছে জওহরলালের রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা।

বর্তমান শতাব্দীর বিস্ময়কর প্রতিভা জওহরলাল।

